গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২০ - ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

জনগণকে বিভক্ত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র এনআরসি ও সিএএ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের পরিকল্পনা হিন্দু মহাসভা, আরএসএস, মুসলিম লিগ উত্থাপন করেছিল এবং পরে জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি তা গ্রহণ করেছিল। তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এই পরিকল্পনায় তৎক্ষণাৎ মদত দিয়ে তা কার্যকর করে দেয়। এই কারণে ভারত, পাকিস্তান উভয় দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। ফলশ্রুতিতে যে অভূতপূর্ব শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয় তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সেদিন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতের জনগণের ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় দায়বদ্ধতা হিসাবেই ঘোষণা করেন যে, সমস্ত শরণার্থীদের কোনও রকম বিধিনিষেধ বা পূর্বশর্ত ছাড়াই ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। পরবর্তীতে বা সম্প্রতি যারা প্রবেশ করেছে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রশ্নটি ভারতের সংবিধান, নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ এবং আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির ভিত্তিতেই দেওয়া যায়। বিজেপি সরকার সে পথে না গিয়ে এবং নাগরিকত্বের প্রশ্নে আগে জাতীয় স্তরে ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নাগরিকত্ব আইনের নূতন একটি সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে এল এবং সেটি সংসদের দুই কক্ষে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে পাশ করিয়ে নিল, যার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

আসলে জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও বিভেদকামী মানসিকতায় উস্কানি দিতে, জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে জনগণের নজর ঘুরিয়ে গণআন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ আটকাতে আর এস এস-বিজেপির এটি এক জঘন্য ষড়যন্ত্র। আমরা বিজেপি সরকারের এই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছি। এ কথাও ভোলা যায় না জনগণকে বিভক্ত করার একই ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে বিজেপি গোটা দেশে রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জি (এন আর সি) চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলও আনা হয়েছে একই জঘন্য পরিকল্পনারই অঙ্গ হিসাবে। এই অবস্থায় আমরা গোটা দেশে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই দুটি পদক্ষেপেরই প্রতিরোধ করা দরকার মনে করি।

একই সাথে আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আন্তর্জাতিক আইন, নিয়ম এবং রীতিনীতি অনুযায়ী যে কোনও দেশের কোনও ব্যক্তি বিশ্বের অন্য যে কোনও দেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং সে দেশের আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয়ের ভেদাভেদ ছাড়াই তাঁর নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার আছে। আমরা দাবি করছি, এই ধরনের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নে ভারত সরকারকেও কঠোরভাবে একই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

এনআরসি-সিএএ-র বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে পথে নেমেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

(উপর থেকে ঘড়ির কাঁটার চলন অনুযায়ী) দিল্লি, হরিয়ানা (বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান), পশ্চিমবঙ্গ (নদিয়া), অন্ধ্রপ্রদেশ (অনন্তপুর), কলকাতা

প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে রাজধর্ম রক্ষার কথা বলতে হয়েছিল কেন

নানাবতী কমিশন

২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের গোধরায় একটি যাত্রীবাহী ট্রেনে রহস্যজনক অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অযোধ্যা ফেরত ৫৯ জন করসেবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পরপরই গুজরাট জুড়ে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর শুরু হয় অবর্ণনীয় হামলা। যা গণহত্যা নামে আন্তর্জাতিক স্তরে কুখ্যাতি লাভ করে। এই সাম্প্রদায়িক গণহত্যার পরেই তদন্তের উদ্দেশ্যে কমিশন ঘোষণা করে সরকার।

২০০২ সালে ৬ মার্চ সরকারি ঘোষণার দ্বারা নিযুক্ত করা হয় সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নানাবতীর নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন। ইতিমধ্যে বহু বেসরকারি তদন্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছে কীভাবে পরিকল্পনা করে হত্যা করা হয়েছে গুজরাটের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের। পুলিশ অফিসারদের মুখ থেকে প্রকাশ পায় কীভাবে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অঙ্গুলিহেলনে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল।

ঘটনার ১৭ বছর পর গত ১১ ডিসেম্বর গুজরাটের বর্তমান বিজেপি সরকার বিধানসভায় রিপোর্টটি পেশ করেছে। যে মুখ্যমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল, তিনি বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী। সর্বোপরি এমন একটা পরিস্থিতি ও পরিবেশে রিপোর্ট প্রকাশ করা হল, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহরা সুপ্রিম কোর্ট, প্রশাসন সহ সমস্ত কিছুকে কুক্ষিগত করে দেশজুড়ে হিন্দুত্ববাদের স্টিমরোলার চালাচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ৩৭০ ধারা বিলোপ, অযোধ্যা রায় বা এনআরসি-ক্যাব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজধর্ম রক্ষার কথা বলতে হয়েছিল কেন

একের পাতার পর

মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকে শুধু পিষে মারাই নয়, সমগ্র দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করার হীন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। এই পরিবেশেই বিচারের নীতিকে ছাপিয়ে উঠেছে ধর্মবিশ্বাস। অযোধ্যা রায়ে উল্লসিত হিন্দুত্ববাদীরা। এই প্রেক্ষাপটে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত থেকেই পরিষ্কার, রায় কী হতে পারে। ঠিক তাই দেখা গেল। নরেন্দ্র মোদিকে পুরো নির্দোষ ঘোষণা করা হল।

এতবড় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটল, এক হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করা হল— যাদের বেশিরভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত— সেখানে সরকারের ভূমিকা কী ছিল তা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। অথচ এর সঠিক উত্তর সামনে না এনে, এর সমস্ত দায় স্থানীয় কিছু পুলিশ অফিসারের উপর চাপিয়ে সরকার ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে 'ক্লিনচিট' দেওয়া হল কমিশনের রিপোর্টে। তৎকালীন তিন আইপিএস অফিসার সঞ্জীব ভাট, রাহুল শর্মা ও আর বি শেখরকুমার কমিশনে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তাতে এই দাঙ্গার সাথে সরকারি মন্ত্রী ও কর্তাব্যক্তিদের সম্পূর্ণরূপে অবহিত থাকার বিষয়টি বার বার সামনে এসেছে। কমিশন এই তিন জনের রিপোর্টকেই উদ্দেশ্যমূলক বলে বাতিল করে দিয়েছে।

ঘটনায় হত্যা করা হয় এহসান জাফরি নামে কংগ্রেসের এক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। তিনি যে ঘটনার পূর্বেই আশঙ্কিত অবস্থায় নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হয়েছিলেন, সেই বিষয়টিও জাফরির স্ত্রীর বয়ানে সামনে আসে। কমিশন এই বিষয়গুলিকেও নস্যাৎ করে দিয়েছে। শুধুমাত্র তৎকালীন জেসিপি, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এ কে ট্যান্ডনের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়েছে। শ্রী ট্যান্ডন ঘটনা শুরুর ঠিক আগে এলাকা ছেড়ে চলে যান এবং শেষে ফিরে আসেন— ফলে তিনি যথাযথ ভূমিকা নিতে পারেননি। ট্যান্ডন কি নিজেই এলাকা ছেড়ে চলে যান, নাকি কারও নির্দেশ ছিল— সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দেওয়া হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, বিজেপির শীর্ষ নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর উক্তি। গুজরাটে

গুজরাট গণহত্যার মুখ

মোদিকে পাশে বসিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাজপেয়ী বলেছিলেন, সরকারকে রাজধর্ম পালন করতে হবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে হবে। এ কথা স্পষ্ট ছিল যে, মোদির উদ্দেশেই প্রধানমন্ত্রী সেদিন এ কথা বলেন। কেন বলেছিলেন বোঝাই যায়। রাজধর্ম পালনে অবহেলা সত্ত্বেও নানাবতী কমিশন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর কোনও দায় খুঁজে পেল না, এটাই বিস্ময়কর।

আজ, দেশ জুড়ে যখন ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশকে ধ্বংস করার দক্ষযজ্ঞ চলছে, তখন নানাবতী কমিশনের এই রায় নিয়ে খুব বেশি হইচই হয়ত হবে না বরং নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহদের আরও মসীহা করে তুলবে। কিন্তু ইতিহাস একদিন জবাব চাইবেই।

বিপিসিএল ঃ কেরালায় পদযাত্রা

লাভজনক সরকারি সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল) -কে বেচে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। বর্তমানে এই সংস্থার মোট সম্পদ ৯ লক্ষ কোটি টাকা। তা সত্ত্বেও কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের স্বার্থে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। এর প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে ১২ ডিসেম্বর কেরালায় ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ পদযাত্রা হয়। ত্রিপুনিথুরা শহর থেকে কোচি রিফাইনারি পর্যন্ত এই পদযাত্রার সূচনা করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কেরালা রাজ্য সম্পাদক ডঃ ভি ভেনুগোপাল (ইনসেট)। শয়ে শয়ে মানুষের মিছিল কোচি রিফাইনারিতে পৌঁছলে জয়েন্ট স্ট্রাগল কমিটির নেতৃত্বে সেখানকার শ্রমিকরা স্লোগানে গলা মেলান। সেখানে এক সভায় এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক ভি কে সদানন্দন সভাপতিত্ব করেন। প্রধান বক্তা দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়সন যোশেফ ও জেলা সম্পাদক টি কে সুধীরকুমার সহ জয়েন্ট স্ট্রাগল কমিটির নেতারা বক্তব্য রাখেন।

অযোধ্যা নিয়ে এএসআই রিপোর্ট আগাগোড়া ভ্রান্তিতে ভরা

৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস হিসাবে পালিত হয়। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-বজরং দল-আরএসএস সহ বিজেপির ধর্মীয় সংগঠনগুলির তাণ্ডবে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল সৌধটি। সৌধের নিচে মন্দির না মসজিদের ভগ্নাবশেষ রয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল তুঙ্গে। এই প্রেক্ষিতে ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি নিয়ে মামলার রায় দিয়েছে। গত প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে ওই জায়গায় বাবরি মসজিদ যে দাঁড়িয়েছিল শীর্ষ আদালত তা মেনে নিয়েছে শুধু তাই নয়, কোর্ট বলেছে সাতাশ বছর আগে সারা দেশ থেকে হাজার হাজার লোক জড়ো করে বর্বরদের মতো একটা পাঁচশো বছরের প্রাচীন সৌধ ভেঙে দেওয়াটা বেআইনি। রিপোর্টের ভিত্তিতে শীর্ষ আদালত বলল, ধ্বংস করে দেওয়া বাবরি মসজিদের নিচে অ-ইসলামিক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেলেও তা হিন্দু মন্দিরের অবশেষ এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই রায়ের কোথাও সুপ্রিম কোর্ট বলেনি যে ওইখানে রামের জন্মস্থান। বলেছে এটা হিন্দুদের বিশ্বাস। বিশ্বাস আর প্রমাণ এক নয়। এর পর সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে ভেঙে দেওয়া বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির হবে এবং সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে অযোধ্যার অন্যত্র ৫ একর জমি দেওয়া হবে।

সাংবিধানিক নৈতিকতা ও প্রমাণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে সরিয়ে রেখে বিশ্বাসকেই বড় করে তোলা এই রায় নিয়ে জনমানসে নানা প্রশ্ন উঠছে। অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে এই রায়ের পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত দিকটি দেখা যাক।

অযোধ্যা মামলার এই রায়দানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এর রিপোর্ট। খননের মধ্য দিয়ে মাটির বিভিন্ন স্তরে ছোট বড় পুরাকালের যা কিছু অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় তার মধ্য দিয়ে পুরাতাত্ত্বিক সেই যুগের নানা বিষয় নিয়ে আমাদের একটা ধারণা তৈরি করে দেন। তাই ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী ডিএনএ বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেস্টের মতো পুরাতত্ত্ব আইনি পরিভাষায় কোনও ঘটনার ফ্যাক্ট বলতে যা বোঝায় তা কখনই নয়। অযোধ্যায় এএসআই প্রথম খনন কার্য করেছিল ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ শাসনকালে। সেই সময় এএসআই এর ডিরেক্টর জেনারেল আলেকজান্ডার কানিংহামের নেতৃত্বে এই খননকার্য পরিচালিত হয়েছিল। রিপোর্টে কানিংহাম তিনটে স্তূপের কথা উল্লেখ করেছেন। যাদের দুটি বৌদ্ধস্তূপের মতো, অন্যটি বৌদ্ধবিহারের মতো। এরপরের খননকার্য ১৯৬৯ সালে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ তার রিপোর্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছিল তা হল প্রাক মধ্যযুগীয় সময়ে ওই অঞ্চলে বসতি ছিল। অযোধ্যার ওই বিতর্কিত জায়গায় তৃতীয় খননকার্যটি হয় ১৯৭৫-৮০ সালের মধ্যে। এ এস আইয়ের সেই সময় ডিরেক্টর জেনারেল বি বি লাল খনন করে যে রিপোর্ট জমা দেন (ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি ১৯৭৬-৭৭) তাতে কোথাও স্তম্ভ পাওয়ার কথা নেই। অথচ ১৯৯৯-এ এসে সেই তিনি আরএসএস-এর পত্রিকা 'মন্থনে' প্রথমবার বললেন যে, ওই বিতর্কিত স্থানে স্তম্ভের মতো কিছু পাওয়া গেছে। স্বভাবতই চিন্তাশীল মহলে প্রশ্ন ওঠে উনি যদি খননকার্যের সময় স্তম্ভ আবিষ্কার করে থাকেন তাহলে তা রিপোর্টে উল্লেখ না করে ১৪ বছর বাদে হঠাৎ আর এস এস-এর পত্রিকায় লিখলেন কেন?

এরপর এলাহাবাদ হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে খননকার্য চালানো হয়। আদালত প্রথমে জিপিআর করতে বলে। জিপিআর হল পুরাতাত্ত্বিক খননকার্য চালানোর একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি। মাটির ভিতরে রেডিও তরঙ্গ পাঠিয়ে দেখা হয় যে তা কোনও বাধা পাচ্ছে কিনা। এরপর তার সূত্র ধরে খনন করে দেখা হয় সেই জায়গায় মাটির ভিতরে কী আছে। প্রথমে ১৮৪টি বাধা পাওয়া গেলেও যখন খনন শুরু হল তখন মাত্র ৩৯টি বিষয়কে নির্দিষ্ট করা হল। আশ্চর্যের বিষয় এর মধ্যে একটিও স্তম্ভ পাওয়া না গেলেও জি পি আর তার রিপোর্টে স্তম্ভ পাওয়ার কথা উল্লেখ করল। এই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন এমন উঠল যে ২১ মার্চ ২০০৩ এ এস আই রিপোর্ট দিল, এই জিপিআর রিপোর্ট পরস্পরবিরোধী, এর থেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, এর উপর নির্ভর করা যাচ্ছে না।

এরপর হাইকোর্টের নির্দেশে ডঃ বি আর মনিকে প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করে এ এস আই 'রামলালা বিরাজমান' এর চৌহদ্দির চারপাশে ১০ ফুট ছেড়ে খননকার্য শুরু করে এবং ৫৭৪ পাতার একটা রিপোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টে দাখিল করে। এ এস আই-এর রিপোর্টটি আগাগোড়া পড়লে দেখা যাবে যে সেটি আগাগোড়া ভ্রান্ত এবং অ-নির্ভরযোগ্য। শুধু তাই নয়, আদালতের নির্দেশে ওই খননকার্য চালানো হলেও প্রথম থেকেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে মাটির নিচে একটি হিন্দু মন্দির আছে এবং সেটি রামলালার। কোনও পূর্ব ধারণার ভিত্তিতে অনুসন্ধানকে আর যাই হোক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বলা যায় না। এই রিপোর্টেও একটা মনগড়া ধারণাকে প্রমাণ করার জন্য যা যা করার দরকার করা হয়েছে, যা যা বলার দরকার রিপোর্টে তা বলা হয়েছে। যে যে বিষয় এই পূর্বনির্ধারিত ধারণার সঙ্গে মেলে না তাকে রিপোর্টে দেখানো হয়নি। যেমন পশুর হাড়, চিত্রিত পাত্র, গ্লেজড টাইলস পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তা রিপোর্টে উল্লেখ হয়নি। ডক্টর মনির নেতৃত্বে এএসআই প্রথম থেকেই পুরাতাত্ত্বিক খনন কার্যের সাধারণ নিয়মনীতির কোনও কিছুই মেনে চলেনি। শুধু তাই নয়, খননকার্য কীভাবে চালানো হবে সে সম্বন্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশও মানা হয়নি। খননকার্যের প্রক্রিয়া নিয়ে এমন অভিযোগ আসতে থাকায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট বাধ্য হয় ডঃ বি আর মনিকে এই খননকারী দলের প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নতুন কাউকে নিয়োগের জন্য এ এস আইয়ের ডিরেক্টর জেনারেলকে নির্দেশ দিতে। এ এস আই ৯০টি ট্রেঞ্চ খনন করেছিল এবং এর রিপোর্ট কোর্টে জমা দেওয়া হয়েছিল। ২২ মে-৫ জুন ২০০৩ রিপোর্টে লেখা হল ৩ নং ট্রেঞ্চখনন করে স্তম্ভ পাওয়া গেছে। অথচ কী আশ্চর্য দেখুন ৩ নং ট্রেঞ্চটির খননকার্য শুরু হয়েছিল ৮ জুলাই ২০০৩। অর্থাৎ ৮ জুলাই ২০০৩ এ খননকার্য করে কী পাওয়া যাবে তা এক মাস আগেই রিপোর্টে এ এস আই উল্লেখ করে দিয়েছে। এ যেন রাম না জন্মাতে রামায়ণ লেখার মতো ঘটনা। এএসআই এর রিপোর্টে স্তম্ভ পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। খনন দেখছিলেন এমন প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনেকেই তখন অভিযোগ করেছিলেন এধার ওধার থেকে পাওয়া ইট এক জায়গায় জড়ো করে স্তম্ভের তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে। সেই স্তম্ভ কোনওভাবেই ভারবাহী স্তম্ভ নয়। মজার বিষয় হল ৫৭৪ পাতার এই এ এস আই রিপোর্টের কোথাও বলা হয়নি রাম মন্দিরকে ধ্বংস করেই বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছে! স্ববিরোধিতায় ভরা এই এএসআই রিপোর্ট কোথাও মন্দিরের অস্তিত্বের কোনও উল্লেখ না থাকলেও একদম শেষের অধ্যায়ে রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার পরিচ্ছদে হঠাৎ করে মন্দিরের উল্লেখ করা হয়েছে। মজার বিষয় হল এর আগের

সাতের পাতায় দেখুন

সাম্যবাদের মূল নীতি

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে একটি কর্মসূচি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রচনার দায়িত্ব নেন লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। প্রথম খসড়াটির নাম রাখা হয়েছিল, 'ড্রাফট অফ এ কমিউনিস্ট কনফেশন অফ ফেথ'। এই খসড়াটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রশ্নোত্তরে লেখা বর্তমান রচনাটি দ্বিতীয় খসড়া রূপে এঙ্গেলস তৈরি করেন। কমিউনিজমের আদর্শকে সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য প্রশ্নোত্তর রূপে লিখলেও, এঙ্গেলস এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৭-এর ২৩ নভেম্বর মার্কসকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— প্রশ্নোত্তরে লেখাটার উপর একটু ভাবনা-চিন্তা কোরো। আমার মনে হয়, এভাবে চলবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলি কিছু যুক্ত করেই এটা দাঁড় করাতে হবে এবং নামও হওয়া উচিত 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মার্কস-এঙ্গেলস রচিত সেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার। সুতরাং বর্তমান প্রশ্নোত্তরের লেখাটিকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের খসড়া হিসাবেই দেখতে হবে। এঙ্গেলসের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এবার শেষ কিস্তি।

৩

প্রশ্ন ঃ শান্তিপূর্ণ উপায়ে কি ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ সম্ভব?

উত্তর ঃ এমনটা হলে ভালই হত, কমিউনিস্টরা তাতে বাধাও দিত না। কমিউনিস্টরা খুব ভাল করেই জানে, যে কোনও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ যে শুধু অকার্যকরী তাই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। তারা খুব ভালভাবেই জানে, চাইলেই কারও মর্জিমাফিক বিপ্লব ঘটানো যায় না। সবক্ষেত্রে এবং সব সময়ই বিপ্লব হল পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি, যা বিশেষ কয়েকটি পার্টি বা শ্রেণির নেতৃত্ব বা ইচ্ছার উপর একেবারেই নির্ভরশীল নয়।

কিন্তু কমিউনিস্টরা এটাও লক্ষ করছে যে, প্রায় সব উন্নত দেশেই সর্বহারাদের বিকাশ গায়ের জোরে দমন করা হচ্ছে এবং তার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট বিরোধীরা সর্বশক্তি দিয়ে বিপ্লবের পক্ষেই কাজ করে যাচ্ছে। নিপীড়িত সর্বহারা শ্রেণিকে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেওয়া হলে, আমরা কমিউনিস্টরা সক্রিয় ভূমিকায় নেমে সর্বহারার স্বার্থ রক্ষা করব, যে কাজটা এখন আমরা করছি তাদের দাবি ও বক্তব্যকে ভাষা দিয়ে।

প্রশ্ন ঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান কি এক-ধাক্কায় ঘটানো সম্ভব?

উত্তর ঃ না, সম্পদের উপর যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ যতটা প্রয়োজন, বর্তমান উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে এক ধাক্কায় সেই মাত্রায় বৃদ্ধি করা যেমন অসম্ভব, এটাও তেমনই অসম্ভব। সে কারণে সর্বহারা বিপ্লব, সমস্ত সম্ভাবনাই বলছে যা অবশ্যম্ভাবী, তা পুরনো সমাজকে পাল্টাবে ক্রমে ক্রমে এবং একমাত্র তখনই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটানো সম্ভব হবে যখন তা প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ এই বিপ্লবের গতিপথ কী হবে?

উত্তর ঃ প্রথমেই এই বিপ্লব সূচনা করবে একটা গণতান্ত্রিক সংবিধানের এবং তার মাধ্যমে চালু হবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক শাসন। ইংল্যান্ডের মতো দেশে, যেখানে ইতিমধ্যে জনগণের অধিকাংশই সর্বহারা, সেখানে এই শাসন হবে প্রত্যক্ষ। ফ্রান্স আর জার্মানির মতো দেশে তা হবে পরোক্ষ শাসন। এই দুই দেশে জনগণের বেশিরভাগ অংশে সর্বহারার সাথে মিশে আছে ক্ষুদ্র কৃষক আর শহুরে পেটি বুর্জোয়ারা। এরা ক্রমাগত সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে, এবং রাজনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে ক্রমাগত প্রলেতারিয়েতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। সেইজন্য সর্বহারার দাবিগুলি তাদেরও দাবি হয়ে উঠবে। এর জন্য হয়ত প্রয়োজন হবে দ্বিতীয় একটা লড়াই, কিন্তু সে-লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটবে শুধু সর্বহারার বিজয়ে।

সর্বহারার কাছে গণতন্ত্র একেবারেই মূল্যহীন, যদি না তা সাথে সাথে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর নতুন করে সরাসরি আক্রমণের কাজে লাগে এবং সর্বহারার জীবনধারণের উপায় সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনে কাজ দেয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে প্রধান পদক্ষেপগুলি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে ঃ

১) ব্যক্তিগত মালিকানার পরিধি কমাতে তার উপর বর্ধিত হারে কর, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর চড়া হারে কর, জ্ঞাতিসূত্রে (ভাই, ভাইপো ইত্যাদি) সম্পত্তি-প্রাপ্তির অবসান, ধনীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক ঋণ (কর) আদায় ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ।

২) ভূস্বামী, শিল্পপতি, রেলওয়ে এবং জাহাজ ব্যবসার রাঘববোয়ালদের হাত থেকে ধাপে ধাপে মালিকানা কেড়ে নিতে অংশত সাহায্য নিতে হবে রাষ্ট্রীয় শিল্পের সাথে তাদের প্রতিযোগিতার, আর অংশত করতে হবে সরাসরি বন্ডের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিয়ে।

৩) সমস্ত দেশত্যাগী ব্যক্তি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

৪) শ্রমিকের শ্রমকে সংগঠিতভাবে রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্র, রাষ্ট্রীয় শিল্প আর কর্মশালায় নিয়োগ করা। তার মাধ্যমে শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটানো। যতদিন কারখানায় ব্যক্তিমালিকানা টিকে থাকবে তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মতো বর্ধিত হারে মজুরি দিতে বাধ্য করা।

৫) ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণ লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সমাজের সমস্ত সদস্যের কাজ করার সমান বাধ্যতা। শিল্প শ্রমিক বাহিনী গঠন, বিশেষভাবে কৃষির জন্য।

৬) রাষ্ট্রীয় পুঁজির মাধ্যমে গঠিত জাতীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে আর্থিক লেনদেন আর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করা এবং সমস্ত বেসরকারি ব্যাঙ্ক আর ব্যাঙ্কারদের দমন করা।

৭) রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন পুঁজি এবং শ্রমিক যে হারে বাড়ে সেই হারে কল-কারখানা, কর্মশালা, রেলওয়ে এবং নৌপরিবহণ শিল্পের বৃদ্ধি, সমস্ত অনাবাদী জমিতে আবাদ এবং ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত কৃষিজমির উন্নতি ঘটানো।

৮) মায়ের কোল ছাড়ার মতো বয়সে এলেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্রীয় খরচে সমস্ত শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষাকে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করা।

৯) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমিতে বিশাল বিশাল ভবন নির্মাণ, যেগুলি হবে শিল্পে এবং কৃষিকাজে নিযুক্ত নাগরিকদের যৌথ বসবাসের স্থান। সেগুলিতে শহর ও গ্রামীণ উভয় জীবনের সুযোগ-সুবিধাগুলোকে যুক্ত করতে হবে, যাতে কোনওটার একপেশে প্রভাব কিংবা অসুবিধা নাগরিকদের ভোগ করতে না হয়।

১০) শহর গ্রামের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর এবং বাসের অযোগ্য বাড়ি ও বসতি ভেঙে ফেলা।

১১) বিবাহিত বা অবিবাহিত পিতা-মাতার সন্তান নির্বিশেষে সমস্ত শিশুর উত্তরাধিকারের সমান সুযোগ।

১২) পরিবহণের সমস্ত উপায়-উপকরণ রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

এ কথা ঠিক, এই সমস্ত পদক্ষেপ একসঙ্গে নেওয়া যায় না। কিন্তু একটি শুরু করলেই পরপর অন্যগুলি নেওয়া সহজ হয়ে যায়। ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিমূলে প্রথম বৈপ্লবিক আঘাতটি হানলেই সামগ্রিকভাবে পুঁজি, কৃষিউৎপাদন, শিল্প, পরিবহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কেন্দ্রীভূত করার কাজে সর্বহারা শ্রেণি নিজেই আরও এগিয়ে চলার আবশ্যকতা বুঝতে পারবে। উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি যত বাস্তবায়িত হতে থাকে সামাজিক কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াও তত বাড়ে। সর্বহারা শ্রেণি তার শ্রমের দ্বারা দেশের উৎপাদিকা শক্তিকে যে হারে বাড়িয়ে চলে, সে হারেই বাড়ে এই কেন্দ্রীকরণের গতি। শেষ পর্যন্ত যখন পুঁজি, উৎপাদন, আর বন্টন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে জাতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে, ব্যক্তিগত মালিকানা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, টাকা হয়ে পড়বে অকার্যকরী। উৎপাদন এতটাই বাড়বে এবং মানুষ এমনভাবে বদলে যাবে, যাতে পুরনো সামাজিক সম্পর্কের শেষ চিহ্নটুকুও ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ শুধুমাত্র একটি দেশে এই বিপ্লব হতে পারে কি?

উত্তর ঃ না। বৃহদায়তন শিল্প বিশ্ব-বাজার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত জাতি, বিশেষত সভ্য জাতিগুলিকে এমনভাবে সংযুক্ত করেছে যাতে একটি জাতির জীবনে যা ঘটছে তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে অন্যান্য জাতি। তা ছাড়া, বৃহদায়তন শিল্প সকল সভ্য দেশের সামাজিক বিকাশের ধারাকে একসাথে এমন এক স্তরে নিয়ে গেছে, যাতে এই দেশগুলির প্রত্যেকটিতে বুর্জোয়া আর সর্বহারা শ্রেণি হয়ে উঠেছে সমাজের দুই নির্ণায়ক শ্রেণি। আর তাদের মধ্যে সংগ্রামটা হয়ে উঠেছে এখনকার দিনের মুখ্য সংগ্রাম। কাজেই, কমিউনিস্ট বিপ্লবটা এখন শুধু একটা জাতীয় বিপ্লবের আকারে হবে না, এই বিপ্লব একই সাথে ঘটবে সমস্ত সভ্য দেশে, অন্তত ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স আর জার্মানিতে হবে একই সাথে। কোন দেশে শিল্পের বিকাশ, সম্পদ এবং উৎপাদিকা-শক্তির পরিমাণ কীভাবে বেড়েছে, তার উপর নির্ভর করবে সে দেশে এই বিপ্লবের বিকাশ হবে দ্রুত হারে, নাকি এর গতি হবে ধীর। জার্মানিতে এই বিপ্লবের গতিবেগ হবে সবচেয়ে কম এবং সাফল্য অর্জন করাও হবে সবচেয়ে কঠিন। ইংল্যান্ডে হবে সবচেয়ে দ্রুত এবং সবচেয়ে সহজ। বিশ্বজুড়ে অন্যান্য সকল দেশের উপর এর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়বে, তাদের বিকাশের বর্তমান ধারাকে এই বিপ্লব পুরোপুরি বদলে দিয়ে তাকে ত্বরান্বিত করবে দ্রুত হারে। এই বিপ্লব বিশ্বব্যাপী, তাই তার সম্ভাবনাও বিশ্বব্যাপী।

প্রশ্ন ঃ ব্যক্তিগত মালিকানার চূড়ান্ত অবলুপ্তির ফল কী হতে পারে?

উত্তর ঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ব্যক্তি মালিকের হাত থেকে সমস্ত উৎপাদিকা শক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বন্টন ব্যবস্থা ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেওয়া। উৎপাদনের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও সামগ্রী যতটা পাওয়া যাচ্ছে সেই অনুযায়ী সমাজের সকলের প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে উৎপাদিকা শক্তিকে কাজে লাগানো। এর মধ্য দিয়েই বৃহদায়তন শিল্পের বর্তমান কুপ্রভাবগুলি সমাজ থেকে মুছে যাবে। সেদিন সংকটের অবসান ঘটবে। উৎপাদন আরও বাড়বে, যদিও আজকের সমাজব্যবস্থায় বর্ধিত উৎপাদন মানেই অতিউৎপাদন, যা জনগণের চরম দুর্দশার কারণ হয়ে ওঠে। পরবর্তী সমাজে দেখা যাবে এই বর্ধিত উৎপাদনও যথেষ্ট নয়, বরং আরও ক্রমাগত বেশি বেশি করে উৎপাদন বাড়িয়ে চলতে হচ্ছে। বর্ধিত উৎপাদন সেদিন আর দুর্দশার জন্ম দেবে না। সমাজের আশু প্রয়োজন মেটানোর কাজকে ছাপিয়ে অতিউৎপাদন সকলের সব প্রয়োজন মেটানোর দিকে নজর দেবে। এই অগ্রগতি অর্জন করতে গিয়ে জন্ম হবে নতুন নতুন চাহিদা আর তা মেটানোর শক্তির। নতুন অগ্রগতির আবশ্যক শর্ত এবং কারণ হয়ে উঠবে এই ক্রমবর্ধমান উৎপাদন। তার জন্য, এতদিন যা ঘটে এসেছে তার মতো, সমাজকে বিশৃঙ্খলার পথে ঠেলে দেওয়ার দরকার হবে না। ব্যক্তিমালিকানার জোয়াল থেকে মুক্তি পেলেই বৃহদায়তন শিল্প যে স্তরে বৃদ্ধি পাবে তার পাশে আজকের বৃহদায়তন শিল্পের আকার নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে পড়বে। যেমন পুরনো ক্ষুদ্র শিল্পকে (ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প) আজকের বৃহদায়তন শিল্পের পাশে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর দেখায়, বিষয়টা তেমনই ঘটবে। শিল্পের এই অগ্রগতি সমাজের হাতে তুলে দেবে প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট দ্রব্যসামগ্রী।

একইভাবে কৃষিক্ষেত্রেও এখনই যে উন্নত ব্যবস্থাগুলি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে প্রয়োগ করা যেত, ব্যক্তি মালিকানা এবং ছোট ছোট জোতে জমির বিভাজনের চাপে তা আটকে গেছে। এক্ষেত্রেও সামাজিক মালিকানা নিয়ে আসবে নতুন উদ্দীপনা, সমাজের হাতে তুলে দেবে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন। এভাবেই সমাজের সকল সদস্যের সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট উৎপাদন এবং তার বন্টন সম্ভব হবে। পরস্পর বিরোধী শ্রেণিতে সমাজের বিভাজন এর মধ্য দিয়ে অকার্যকরী হয়ে পড়বে। শ্রেণি বিভাজন শুধু অকার্যকরী হবে তাই নয়, নতুন সমাজ ব্যবস্থার সাথে তা কোনওভাবেই খাপ খাবে না। শ্রম বিভাজনের ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণি, সেই শ্রমবিভাগ এতদিন যে আকারে রয়েছে, তা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে।

শিল্প এবং কৃষির যে স্তরে উন্নতির কথা বলা হচ্ছে, তার জন্য শুধু

পাঁচের পাতায় দেখুন

কোনও কিছুর অধিকার না থাকাটাই দস্তুর সাফাই কর্মীদের

ছবিটি এখনও হয়ত অনেকের চোখে ভাসছে— প্রধানমন্ত্রী উবু হয়ে বসে পা ধুইয়ে দিচ্ছেন এক সাফাই কর্মীর। সরকার অনুগত সংবাদমাধ্যম দৃশ্যটিকে ছড়িয়ে দেয় সারা দেশের মানুষের কাছে। প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি যে একেবারে নিচুতলা পর্যন্ত রয়েছে তা প্রচার করতেই এমন একটি নাটকীয় দৃশ্য সেদিন রচনা করা হয়েছিল। না হলে এই ঘটনার পর অন্তত আদিম পদ্ধতিতে সাফাইয়ের কাজ থেকে সাফাইকর্মীদের বের করে আনার চেষ্টা হত। তা যে হয়নি তার অজস্র প্রমাণের মধ্যে সর্বশেষ চেন্নাইয়ের শপিং মলের ঘটনাটি।

চেন্নাইয়ের একটি শপিং মলে ২৫ বছরের যুবক অরুণকুমার, তাঁর ভাই ও আরও চারজন সাফাই কর্মী মালিকের নির্দেশে সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে একটানা বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভাইকে বাঁচাতে ট্যাঙ্কের ভিতরে ঢোকেন তিনি। নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ভাইকে কোনওরকমে বের করতে পারলেও নিজে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

শুধু একটা ঘটনা নয়। তামিলনাড়ুতে সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যায় সাফাই কর্মী মারা গিয়েছেন। ২০১৩-২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ুতেই শুধু মারা গিয়েছেন ১৪৪ জন। এর পরেই আছে উত্তরপ্রদেশ। সেখানে একই সময়ে মারা গিয়েছেন ৭১ জন। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক হিসেবে আমাদের আহ্লাদিত হওয়ার কিছু নেই। যত্রতত্র দেখা যায় দু-তিন জন সাফাইকর্মী রাস্তার মাঝে কোনও নিরাপত্তা ছাড়াই ম্যানহোলে নেমে বালতি বালতি দুর্গন্ধময় পাঁক তুলে পরিষ্কার করছেন, দিনের শেষে নামমাত্র মজুরির আশায়। মাঝে মধ্যে যখন ম্যানহোলের বিষাক্ত গ্যাস থেকে দু-একজন উঠে আসতে পারেন না, তখন তা মিডিয়ায় বড়জোর এক সেকেন্ডের কিংবা সংবাদপত্রের এক কোণে জায়গা পায়। মানুষের মনে তার রেশ থাকে দু-একদিন। তারপর আবার সবকিছু চলে আগের মতোই।

রাজ্যে রাজ্যে অসংখ্য সাফাই কর্মী দৈনন্দিন শহরজীবনের মলমূত্র থেকে শুরু করে নানা নোংরা সাফাইয়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সম্বল বলতে তাদের থাকে একগাছা দড়ি ও বালতি। থাকে না দুর্গন্ধযুক্ত গহ্বরে কাজ করার উপযুক্ত গ্যাস-মুখোশ। থাকে না হাতে দস্তানা, পায়ে গামবুট, শরীরে বিশেষ জ্যাকেট, মাথার হেলমেট। অক্সিজেনের অভাবে কাজ করতে করতে অন্ধকার গর্তে মৃত্যু হয় বহু সাফাই কর্মীর। সেই সংখ্যার হিসেবও থাকে না সরকারের কাছে। বহু জনের শ্বাসপ্রশ্বাসের রোগ এবং চামড়ার রোগ দেখা দেয়, যা অনেক সময় জীবনঘাতী পর্যন্ত হয়। অথচ আধুনিক পদ্ধতিতে সাফাইয়ের নানা রকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যবহারও হচ্ছে। কিন্তু ভারতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কোনও ব্যবস্থাই করেনি সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ। এখনও চলছে প্রাচীন পদ্ধতিতে কাজ।

আপৎকালীন পরিস্থিতি ছাড়া সাফাইকর্মীকে নিকাশি নালায় নামিয়ে পাঁক পরিষ্কার করতে বাধ্য করা অপরাধ— ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট এমন নির্দেশ দিয়েছিল। এমনকি সুরক্ষা-সরঞ্জাম নিশ্চিত না করে আপৎকালীন পরিস্থিতিতেও কাজ করানো যাবে না সাফাই কর্মীদের, এমনটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে 'দ্য এমপ্লয়মেন্ট অফ ম্যানুয়াল স্ক্যাভেনজার্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অফ ড্রাই ল্যাট্রিনস (প্রহিবিশন) অ্যাক্ট' অনুযায়ী শুধু হাতে করে নোংরা পরিষ্কারই নিষিদ্ধ করা হয়নি, উপরন্তু মানুষের বর্জ্য পরিষ্কার করানোর জন্য লোক নিয়োগ করলে পাঁচ বছরের জন্য জেলের বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে কী? আমাদের দেশে আইন মেনে কাজ ক'টা জায়গায় হয়? ফলে এ ক্ষেত্রেও চলে চূড়ান্ত অবহেলা এবং বেআইনিভাবে কাজে নিয়োগ। সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনও ক্ষেত্রেই তাদের কাজের জন্য নেই কোনও নিরাপত্তা, নেই উপযুক্ত মজুরি। উপরন্তু দরিদ্র ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষেরা বেশিরভাগ এই কাজে যুক্ত থাকায় এ ক্ষেত্রে অবহেলা আরও বেশি।

শহরের বড় বড় হোটেল, অন্যান্য ব্যবসায়িক কেন্দ্র বা বাড়িগুলিতে ঠিকমতো নর্দমা পরিষ্কার করা হয় না, ফলে সেগুলি কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। জীবন অচল হয়ে পড়ে। পুর কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন দালাল মারফত নিযুক্ত এই শ্রমিকরা সেই সময় শহুরে মানুষের জীবনকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে প্রাণ হাতে করে নেমে পড়ে অন্ধকার কূপে। এদের অধিকাংশই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। মানুষ হিসেবে তাদের যে অধিকার, সেই অধিকারবোধ সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই এদের। অনেকেই এই অসহনীয় পরিবেশে কাজ করতে করতে পাঁকের গন্ধ থেকে মুক্তি পেতে মদের নেশায় ডুবে যায়। এদের জীবনটা আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের থেকে অন্যরকম। বিষাক্ত পরিবেশে কাজ করায় অনেকে কিছুদিন পরই কর্মক্ষমতা হারায়। বেঁচে থেকেও উপযুক্ত মূল্য পায় না এঁরা, আর মারা গেলে তো এ সবের বালাই নেই। আবার মৃতদের অনেকের পরিবারই ক্ষতিপূরণের টাকা পর্যন্ত পায় না। এই না-মানুষদের জীবনে কোনও কিছুর অধিকার না থাকাটাই যেন দস্তুর। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমস্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে এমন দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করে মালিকরা আর তাদের তাঁবেদার সরকারগুলি। সাফাই কর্মীরা কোন ছার!

৭ দফা দাবিতে পৌরস্বাস্থ্য কর্মীদের ধরনা

১২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের ডাকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে ধরনা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

রাজ্যের ১২৬টি পৌরসভা ও নিগমে কর্মরত প্রায় দশ হাজার পৌর স্বাস্থ্যকর্মী চরম বঞ্চনার শিকার। পৌর এলাকায় বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষদের বিশেষত মহিলা ও শিশুদের অপুষ্টির বিষয়ে সমস্ত কাজ, টিকাকরণ, পতঙ্গ বাহিত, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের সচেতনতা, পোলিও, ফাইলেরিয়া, কুষ্ঠ রোগের প্রতিষেধক টিকা ও ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব এঁদের উপর। ১৯১৭ সাল থেকে বিনা পারিশ্রমিকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-এর কাজও এঁদের দিয়ে। এ ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় স্কুলে পরীক্ষা চললে, খেলাধূলা হলে এই পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের ডিউটি দিতে হয়।

এদের কাজের পরিধি দিনের পর দিন বাড়ানো হচ্ছে, কিন্তু বেতন মাত্র ৩, ১২৫ টাকা। কোনও অবসরকালীন ভাতা না দিয়ে শূন্য হাতে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পিএফ, গ্র্যাচুইটি, পেনশন দেওয়া হয় না। নেই শ্রমিকের স্বীকৃতি। সীমাহীন এই বঞ্চনা নিরসনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী, পৌরমন্ত্রীর কাছে বহুবার স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। গত বছর মুখ্যমন্ত্রী মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের অবসরসীমা পঁয়ষট্টি করে দেবেন। পৌরমন্ত্রীও এই দাবির যৌক্তিকতা মেনে গ্র্যাচুইটি চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি।

রাজ্য সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু, যুগ্ম সম্পাদক পৌলমি করনজাই ও কেকা পাল বলেন, অবিলম্বে কাজের বয়স ৬৫ বছর পর্যন্ত করতে হবে, স্বেচ্ছাসেবী নয় কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে, সাম্মানিক ভাতা নয় পদ অনুযায়ী সম্মানজনক বেতন দিতে হবে, ইপিএফ, পেনশন এবং অবসরের এককালীন তিন লক্ষ টাকা দিতে হবে, প্রতি বছর ৫ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পদোন্নতি চালু করতে হবে, তারপরে শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ করতে হবে, জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করতে সাবসেন্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে, আধুনিকীকরণ, ওষুধ এবং প্রতিষেধক টিকার পর্যাপ্ত সরবরাহ করতে হবে।

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

নাগরিকত্ব আইন ঃ তথ্যেই বোঝা যায় মতলব

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, নাগরিকত্ব আইনে সংশোধনের ফলে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হবেন। বিজেপি তথা আরএসএস নেতাদের অঙ্ক, গোটা দেশে অন্তত এক থেকে দেড় কোটি শরণার্থী নাগরিকত্ব পাবেন। এই 'হিন্দু' তথা অ-মুসলিমদের নাগরিকত্ব দিয়ে ভোটের বাক্সে তার সুফল কুড়োনো যাবে। ... কিন্তু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হিসেব, নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের সুবিধা পাবেন গোটা দেশে মাত্র ৩১,৩১৩ জন। যাঁদের মধ্যে ২৫,৪৪৭ জন হিন্দু। ৫৮০৭ জন শিখ। খ্রিস্টান ৫৫ জন। ২ জন বৌদ্ধ। ২ জন পার্সি। নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে বাংলাদেশ-পাকিস্তান-আফগানিস্তানে ধর্মীয় উৎপীড়নের শিকার হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান ও পার্সি শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে মোদি সরকার। এই বিল নিয়ে আলোচনার সময়ে ইন্টেলিজেন্স বুরো (আইবি)-র কাছে সংসদের যৌথ কমিটি জানতে চেয়েছিল, কত জন এর সুবিধা পাবেন। আইবি-র ডিরেক্টর জানান, তাঁদের রেকর্ড অনুযায়ী ওই তিন দেশের ৩১,৩১৩ জন ধর্মীয় উৎপীড়নের শিকার হয়ে ভারতে এসেছেন। যাঁদের দীর্ঘমেয়াদি ভিসা দেওয়া হয়েছে। সংখ্যাটা এত কম কি না, তা নিয়ে ডিরেক্টরের ব্যাখ্যা, আরও অনেকেই থাকতে পারেন যাঁরা এসেছেন। কিন্তু হয়তো তাঁরা নাগরিকত্ব, রেশন কার্ড, পাসপোর্ট পেয়ে গিয়েছেন।

যৌথ কমিটির সামনে মন্ত্রক জানায়, বাংলাদেশ থেকে এসে কোন রাজ্যে কত জন বাস করছেন, তার পরিসংখ্যান নেই। ... তা হলে বিজেপি নেতৃত্ব 'লক্ষ লক্ষ মানুষের' সন্ধান পেলেন কী করে? বিজেপি সূত্রের বক্তব্য, এখনও নাগরিকত্ব না-পাওয়া অনেকেই বাংলাদেশ থেকে আসার সময়ে জানাননি যে, তাঁরা ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে এসেছেন। এখন তাঁরা তা জানিয়ে নাগরিকত্বের আবেদন করবেন। যাঁরা ভারতে আসার সময় ধর্মীয় উৎপীড়নের কথা জানাননি, এখন জানালে কি তা মেনে নেওয়া হবে? কী করে তা প্রমাণ হবে? যৌথ কমিটিও আইবি-র কাছে সেই প্রশ্ন তুলেছিল। কমিটির রিপোর্ট বলছে, আইবি-র ডিরেক্টর জানান, নাগরিকত্বের আর্জি জানাতে তাঁদের ধর্মীয় উৎপীড়নের প্রমাণ দিতে হবে। আসার সময়ে এ কথা না-বললে এখন তা প্রমাণ করা কঠিন হবে। এমন দাবি উঠলে তা গুপ্তচর সংস্থা র' সহ অন্যান্য সংস্থা তদন্ত করে দেখবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ ডিসেম্বর, '১৯)

সাম্যবাদের মূল নীতি

তিনের পাতার পর

যান্ত্রিক বা রাসায়নিক কুশলতাই যথেষ্ট নয়। যে মানুষ এই কুশলতাকে কার্যকর করবে তাদের যোগ্যতাকেও প্রয়োজনীয় উচ্চতায় বিকশিত করা দরকার। ঠিক যেমন বিগত শতাব্দীতে কৃষক এবং পুরনো ক্ষুদ্র শিল্পের (ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিক) শ্রমিকদের বৃহদায়তন শিল্পে টেনে আনার পর তারা নিজেদের জীবনযাত্রার আমূল বদল ঘটিয়ে পুরোপুরি নতুন মানুষে পরিণত হয়েছিল। একইভাবে সমগ্র সমাজের যৌথ পরিচালনায় উৎপাদনের নতুন ধরনের অগ্রগতির জন্য সমাজ তার প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষের সৃষ্টি করবে। যৌথ পরিচালনায় উৎপাদন আজকের সমাজের এই মানুষ দিয়ে চলবে না। তারা আজ উৎপাদনের একটি মাত্র শাখাতেই নিযুক্ত হয়ে তাতেই বাঁধা পড়ে গেছে, তার দ্বারা শোষিত হচ্ছে, তারা নিজেদের সকল যোগ্যতার মূল্যে কেবলমাত্র একটি ক্ষমতার পরিচর্যাতেই ব্যস্ত, তারা গোটা উৎপাদনের কেবল একটি মাত্র শাখা বা কোনও শাখার উপশাখাকেই শুধু জানে, এমনসব মানুষ দিয়ে উৎপাদনের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এমনকি আজকের দিনের শিল্পেও এমন মানুষের প্রয়োজন ক্রমাগত কমছে।

সমাজের সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে যৌথ মালিকানায় চলা শিল্পের আবশ্যিক শর্ত হল সর্বাঙ্গীনভাবে বিকশিত মানুষ, যারা উৎপাদনের পুরো ব্যবস্থাটাকে সামগ্রিকভাবে দেখতে সক্ষম। শ্রম বিভাজনের যে ধাঁচা একজনকে কৃষক, আর একজনকে চর্মকার, তৃতীয়জনকে কারখানা শ্রমিক, চতুর্থজনকে শেয়ার বাজারের দালাল বানায়, যন্ত্রের ধাক্কায় ইতিমধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত সে ধাঁচা পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়ে যাবে। শিক্ষা যুবসমাজকে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যবস্থাকে বুঝে নেওয়ার শক্তি দেবে, যাতে তারা সামাজিক প্রয়োজনে বা নিজের আগ্রহের টানে উৎপাদনের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় দ্রুত বিচরণ করতে পারে। বর্তমান শ্রম বিভাজন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর যে একপেশে ভূমিকার তকমা লাগিয়ে দেয় তা থেকে তারা এ পথেই মুক্ত হবে। এই ভাবে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা তার সকল সদস্যকে দেয় তাদের কর্মদক্ষতার সামগ্রিক বিকাশ ও তার পরিপূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণির অবলুপ্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। নিশ্চিতভাবে সাম্যবাদী সমাজের গঠনের সাথে শ্রেণির অস্তিত্বই খাপ খায় না, অন্যদিকে এই সমাজের প্রতিষ্ঠাই শ্রেণিগত বিভেদকে পুরোপুরি মুছে ফেলার পথ করে দেয়।

এর থেকে বোঝা যায়, একই ভাবে শহর-গ্রামের বৈপরীত্যও লোপ পাবে। একেবারে পুরোপুরি বস্তুগত কারণেই সাম্যবাদী সমাজ সংগঠনের আবশ্যক শর্ত হল, দুটি পৃথক শ্রেণির বদলে একই ধরনের জনগণের দ্বারা কৃষি ও শিল্পের পরিচালনা। গ্রামাঞ্চল জুড়ে কৃষিজীবী জনগণের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার পাশাপাশি শিল্পে নিযুক্ত জনগণের বড় শহরে ভিড় জমানোর মধ্যে কৃষি ও শিল্পের অনুন্নত দশাই ফুটে ওঠে। এই দশা যে সমাজের আরও অগ্রগতির পথে বাধা ইতিমধ্যেই তা বোঝা যাচ্ছে।

ব্যক্তি সম্পত্তি অবলুপ্ত হওয়ার প্রধান ফলগুলি হল— সমাজের সকল সদস্যের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির পরিকল্পিত এবং যৌথ ব্যবহার। সকলের প্রয়োজন মেটানো যাবে এমন মাত্রায় উৎপাদনের বিকাশ। যে ব্যবস্থার কারণে সমাজের এক অংশকে বঞ্চিত করার মূল্যে কিছু লোকের সন্তুষ্টি বিধান হয়, তার অবসান। শ্রেণি এবং তার বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের পূর্ণ অবলুপ্তি। এতদিন প্রচলিত শ্রম বিভাজনকে অবলুপ্ত করার মাধ্যমে সমাজের সকল সদস্যের ক্ষমতার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। এর জন্য কারিগরী শিক্ষা, কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তনের সুযোগ, সকলের প্রচেষ্টায় সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দের আয়োজন, শহর ও গ্রামের সংযুক্তি ঘটানোর ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ঃ পরিবার প্রথার উপরে সাম্যবাদী সমাজের কী প্রভাব পড়বে?

উত্তর ঃ সাম্যবাদী সমাজ নারী-পুরুষের সম্পর্ককে করে দেবে একান্ত নিজস্ব বিষয়, কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপার, তাতে সমাজের কোনও হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা থাকবে না। কমিউনিস্ট সমাজ এ কাজ করতে পারে, তার কারণ এই সমাজ ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে, শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় সামাজিক তত্ত্বাবধানে। এইভাবে নির্মূল হবে ব্যক্তিসম্পত্তির উপর গড়ে ওঠা এযাবৎ বজায় থাকা বিবাহ প্রথার দুই মূল স্তম্ভ— স্বামীর উপর স্ত্রীর এবং বাপ-মায়ের উপর সন্তানদের নির্ভরশীলতা। কমিউনিজমে নারীদের 'যৌথ সম্পত্তি' করে তোলার কথা বলে নীতিবাগীশ কূপমণ্ডুকেরা যে শোরগোল করে, এটা হল তার একটা জবাব। নারীকে 'যৌথ সম্পত্তি'তে পরিণত করার বিষয়টি পুরোপুরি বুর্জোয়া সমাজেরই অঙ্গ, এখন সেটা নিখুঁত রূপ পেয়েছে পতিতাবৃত্তিতে। যেহেতু পতিতাবৃত্তির মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানা, এই মালিকানা লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পতিতাবৃত্তিও লোপ পাবে। তাই, সাম্যবাদী সমাজ নারীকে যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত তো করবেই না, বরং তার অবসান ঘটাবে।

প্রশ্ন ঃ বিদ্যমান জাতিসত্তাগুলির প্রতি সাম্যবাদী সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

উত্তর ঃ সম্প্রদায়গত মিলের ভিত্তিতে উদ্ভূত জাতিসত্তাগুলির জনগণ এই সমাজব্যবস্থায় আবশ্যিকভাবেই পরস্পর মিশে যাবে। ভূসম্পত্তি কেন্দ্রিক নানা বিরোধ এবং শ্রেণিগত পার্থক্য তারা দূর করবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের মধ্য দিয়ে।

(মূল খসড়াতে এই জায়গায় লেখা আছে শুধু 'রিমেইন্স' অর্থাৎ 'রয়েছে'। এর উত্তরটি আছে 'ড্রাফট অফ এ কমিউনিস্ট কনফেশন অফ ফেথ'-এর ২১ নম্বর প্রশ্নে। সেটিই এখানে দেওয়া হল। সূত্র ঃ কার্ল মার্কস ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস কালেক্টেড ওয়ার্কস, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স নিউইয়র্ক, ১৯৭৬)

প্রশ্ন ঃ ধর্মের প্রতি কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

উত্তর ঃ এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত ধর্মই কোনও বিশেষ জাতি অথবা জাতিগোষ্ঠীর অগ্রগতির বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্তরের মূর্ত রূপ। কিন্তু সাম্যবাদ হল ঐতিহাসিক অগ্রগতির সেই স্তর, যেখানে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম তার কার্যকারিতা হারিয়েছে এবং তাদের বিলুপ্তির সময় ঘনিয়ে এসেছে।

(মূল খসড়াতে এই জায়গাতেও লেখা আছে শুধু 'রিমেইন্স' অর্থাৎ 'রয়েছে'। উত্তরটি আছে 'ড্রাফট অফ এ কমিউনিস্ট কনফেশন অফ ফেথ'-এর ২২ নম্বর প্রশ্নে। সেটিই এখানে দেওয়া হল। সূত্র ঃ ওই)

প্রশ্ন ঃ কমিউনিস্টদের সঙ্গে সোসালিস্টদের পার্থক্য কী?

উত্তর ঃ তথাকথিত সোসালিস্টদের তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম গোষ্ঠীটি হল সামন্ততান্ত্রিক এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনুগামীদের নিয়ে— যে দু'টি সমাজকে প্রতিদিন ভাঙছে তাদেরই সৃষ্ট বুর্জোয়া সমাজ এবং তার বৃহদায়তন শিল্প ও বিশ্ব বাণিজ্য। সমকালীন সমাজের অনাচার দেখে এই গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত করে, সামন্ততান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যেহেতু এই ধরনের অনাচার ছিল না, তাই সামন্ততন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই সমস্ত অনাচার দূর হতে পারে। তাদের সমস্ত প্রস্তাবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই সুরে বাঁধা। সর্বহারা শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশায় তাদের সহানুভূতি এবং সমবেদনা প্রকাশ পেলেও, এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রীদের বিরোধিতা করতে হবে কমিউনিস্টদের। কারণ,

১) তারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছে।

২) তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছে অভিজাতগোষ্ঠী, গিল্ড-মাস্টার ও কারখানা মালিক, স্বৈরাচারী সামন্তপ্রভু ও তাদের অনুচরবৃন্দ— রাজকর্মচারী, সেনানায়ক আর যাজকদের কর্তৃত্ব। তাদের বর্ণিত পুরনো সমাজে একালের অনাচার ছিল না এটা সত্য, কিন্তু সেই সমাজেও তার নিজস্ব ধরনের অনাচার কিছু কম ছিল না। আর কিছু না হোক, সেগুলি তারা আমদানি করবে। কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার পথে উৎপীড়িত শ্রমিকদের মুক্তির সম্ভাবনাটিও হারিয়ে যাবে।

৩) সর্বহারা শ্রেণি প্রকৃত বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করেছে দেখলেই, এই সমাজতন্ত্রীদের আসল মনোভাব প্রকট হয়ে পড়ে। তখনই তারা সর্বহারা শ্রেণির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে জোট বাঁধে।

সমাজতন্ত্রীদের দ্বিতীয় গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সমর্থকদের নিয়ে। তাদের দুশ্চিন্তা হল, বর্তমান সমাজব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট অনাচারই পাছে এই সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়। তাই তাদের লক্ষ্য হল বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে অটুট রেখে এর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা অনাচারগুলি দূর করার চেষ্টা করা। এই লক্ষ্য নিয়েই তাদের কেউ কেউ চায় কিছু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা চালু হোক, আবার কেউ কেউ ব্যাপক ভাবে সমাজ সংস্কারের কথা বলে। সমাজকে পুনর্গঠন করার নামে, এই ব্যক্তিরা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক কাঠমোটাকে বজায় রাখতে চায়, যার উদ্দেশ্য হল আসলে এই চলতি সমাজটাকেই অটুট রাখা। কমিউনিস্টদের অবিচল ভাবে এই সব বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের বিরোধিতা করতে হবে। কারণ এরা সাম্যবাদের শত্রুদের সঙ্গে কাজ করছে এবং কমিউনিস্টরা যে সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায়, তাকেই রক্ষা করতে চাইছে।

সর্বশেষ বা তৃতীয় গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে। ইতিপূর্বে আলোচিত 'এই বিপ্লবের গতিপথ কী হবে' (*এঙ্গেলস এখানে একটু শূন্যস্থান রেখেছিলেন, খসড়ার ১৮ নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য হিসাবে, সূত্র ঃ ওই*) প্রশ্নের জবাবে কমিউনিস্টরা যে সমস্ত কর্মসূচির কথা বলেছে, তারা এর অনেকগুলিই মানে। কিন্তু এগুলি তাদের কাছে সমাজের সাম্যবাদে উত্তরণের হাতিয়ার নয়। তারা মনে করে এই সব কর্মসূচি যদি বর্তমান সমাজের অনাচার ও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারে সেটাই যথেষ্ট। এই সমস্ত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা হয় নিজেরাই সর্বহারা শ্রেণির মানুষ যারা নিজেদের মুক্তির শর্তগুলি সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট সচেতন নয়, কিংবা তারা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির অন্তর্গত। পেটি বুর্জোয়ারা হল সেই শ্রেণি, গণতন্ত্রের বিজয় অর্জন এবং তার উপর দাঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত যাদের স্বার্থ অনেকাংশেই সর্বহারা শ্রেণির সাথে মিলে যায়। তাই সংগ্রামের সময় কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব বোঝাপড়া করে চলতে হবে এবং সাধারণভাবে অন্তত কিছুকাল তাদের সাথে মিলিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। যতদিন না এই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির সেবায় নিযুক্ত হয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করছে, ততদিন একাজ চলবে। এ কথা অবশ্যই স্পষ্ট যে, মিলিত কর্মসূচিগুলি আদর্শগত পার্থক্য নিয়ে আলোচনাকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ এ কালের অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতিতে পার্থক্য আছে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে, বুর্জোয়া শ্রেণি যেখানে শাসন ক্ষমতায়, সেখানে সাময়িকভাবে কমিউনিস্টদের স্বার্থের সঙ্গে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের স্বার্থ মিলে যায়। আজ প্রায় সর্বত্র গণতন্ত্রীরা সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করছেন, তারা যত বেশি একাজ করে তত তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের লক্ষ্য মিলে যায়। তারা যত বেশি করে সর্বহারার স্বার্থকে তুলে ধরবে ততই তারা সর্বহারা শ্রেণির উপর নির্ভরশীল হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংল্যান্ডের চার্টিস্টদের কথা। চার্টিস্টরা প্রায় সকলেই শ্রমিক শ্রেণির মানুষ। তাই তারা গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া বা তথাকথিত র‍্যাডিক্যালদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে কমিউনিস্টদের কাছাকাছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেখানে যে দলগুলি এই সংবিধানকে বুর্জোয়া শ্রেণির বিরোধিতায় ও সর্বহারার স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে, কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করবে। এর অর্থ হল কমিউনিস্টরা সে দেশের জাতীয় কৃষি সংস্কারকদের সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করবে। সুইজারল্যান্ডে র‍্যাডিক্যালদের মধ্যে নানা স্বার্থের মিশ্রণ থাকলেও, একমাত্র তাদের সঙ্গেই কমিউনিস্টরা একত্রে কাজ করতে পারে। এদের মধ্যে আবার ভাউড ও জেনেভার র‍্যাডিক্যালরাই বেশি অগ্রণী।

সর্বশেষে, জার্মানিতে বুর্জোয়া শ্রেণি ও চরম স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম এখনও শুরু হয়নি। যেহেতু বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতায় আসীন না হওয়া পর্যন্ত কমিউনিস্টরা তাদের চূড়ান্ত মোকাবিলা করতে পারে না। তাই নিজেদের স্বার্থেই কমিউনিস্টদের উচিত বুর্জোয়া শ্রেণিকে যথাসম্ভব দ্রুত ক্ষমতায় আসীন হতে সাহায্য করা, যাতে অতিদ্রুতই তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। সে জন্য রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের কমিউনিস্টদের সাহায্য করতে হবে। কিন্তু তাদের সচেতন থাকতে হবে যাতে তারা বুর্জোয়া শ্রেণির আত্মপ্রবঞ্চনামূলক প্রচারের শরিক না হয়ে পড়ে। বুর্জোয়াদের জয় সর্বহারার কী উপকারে লাগবে সে বিষয়ে মিথ্যা আশ্বাবাণীতে ভুললে চলবে না।

বুর্জোয়া শ্রেণির ক্ষমতা দখল থেকে কমিউনিস্টদের কেবল যেটুকু সুবিধা হতে পারে তা হল ঃ ১, কিছু সুবিধা আদায়, যাতে কমিউনিস্টদের নিজেদের আদর্শের সপক্ষে প্রচার চালানো, আলোচনা করা ও নানা আক্রমণের হাত থেকে আদর্শকে রক্ষা করা সহজ হয়। তার মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রেণিকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ জঙ্গি এবং সুসংগঠিত শ্রেণিতে পরিণত করা যায়। ২, এটা নিশ্চিত যে, যেদিন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হবে সেদিন থেকেই শুরু হবে বুর্জোয়া এবং সর্বহারার মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ। সেই দিন থেকে থেকে জার্মান কমিউনিস্টদের নীতি ও কৌশল হবে যেখানে ইতিমধ্যেই বুর্জোয়ারা শাসকের ভূমিকায় বসেছে, সেই সব দেশের কমিউনিস্টদের অনুসৃত নীতি ও কৌশলের অনুরূপ। (সমাপ্ত)

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(২১)

রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ গভীর দুঃখের সাথে বলেছিলেন, "আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল্ [জেমস বসওয়েল (১৭৪০-'৯৫) ছিলেন ইংলন্ডের প্রখ্যাত লেখক ও জীবনীকার] কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা সবলতা গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। ...সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা, যাহা তিনি অধিকাংশ সময়ে মুখের কথায় ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।" বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের অন্তঃতল দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, বিদ্যাসাগর চরিত্রের অপার বিশালতা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে সঞ্জীবিত হওয়া প্রয়োজন।

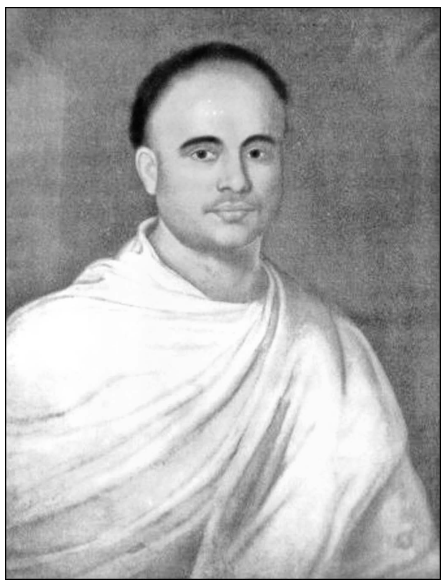

শৈশবে বিদ্যাসাগরের লেখা 'বর্ণপরিচয়'-তেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম কাব্যের ধ্বনি শুনেছিলেন। তা নিয়ে পরে যখন স্মৃতিচারণ করেছেন সে গদ্যও যেন এক কাব্যের রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা।"

বিদ্যাসাগরের সাথে রবীন্দ্রনাথের একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৮২ সালে, বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাড়িতে। একটি সাহিত্য-সমিতি (সারস্বত সমাজ) করার উদ্যোগ নিয়ে এবং সেই সমিতিতে বিদ্যাসাগরকে থাকতে বলার আবেদন নিয়ে তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁদের সব পরিকল্পনা শুনে বলেছিলেন, "ভাল উদ্যোগ। কিন্তু আমার অনুরোধ, হোমরাচোমরাদের এর মধ্যে রেখো না। ওতে কাজ পণ্ড হয়।" ঘটনাচক্রে সত্যিসত্যিই সে সমিতি কিছুদিনের মধ্যে উঠে গিয়েছিল।

আরেকবার, রবীন্দ্রনাথ তখন ম্যাকবেথ-এর কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর ইংরেজির গৃহশিক্ষক বললেন, 'চলো, অনুবাদটা বিদ্যাসাগর মশাইকে দেখিয়ে আসা যাক।' শিক্ষক মহাশয়ের সাথে রবীন্দ্রনাথ একদিন গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। 'জীবনস্মৃতি'-তে সেদিনের কথা স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাতে লিখেছেন, "তখন তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বসিয়াছিলেন। পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই, অতয়েব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম।" এই দু'বার ছাড়া বিদ্যাসাগরের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ সম্ভবত আর হয়নি। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার তখন ব্রাহ্মধর্মের উপাসক। পরিবারের সদস্যদের উপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবল প্রভাব।

১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগর প্রয়াত হন। উল্লেখযোগ্য ভাবে, সে বছরই মে মাসে রবীন্দ্রনাথ 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার'-এর মতো ছোটগল্প লিখে প্রকাশ করছেন। সমাজে নারী জীবনের উপর কত বড় নিপীড়ন চলছে রবীন্দ্রনাথ তা দেখাচ্ছেন কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে। বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ-সংবাদ আসার পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশ করা হল "বিদ্যাসাগর রচিত 'আত্মজীবনচরিতের' কয়েক পৃষ্ঠা" শীর্ষক লেখা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এই সংখ্যায় (কার্তিক, ১২৯৮) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। ইহাতে অলঙ্কারবাহুল্য বা আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই। পূজনীয় লেখক মহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া মনে একান্ত আক্ষেপ জন্মে। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালীদের পক্ষে শিক্ষার স্থল হইত।" ১৮৯২ সালে 'সাহিত্য' পত্রিকাতেই প্রথম ছাপা হয় বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতীসম্ভাষণ'। লেখাটি পড়ার সাথে সাথেই রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় লিখলেন, "স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণারসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না।"

১৮৯৫ সালের ২৯ জুলাই কলকাতার বিডন স্ট্রিটে এমারেল্ড থিয়েটার (১৮৮৭-১৮৯৬) মঞ্চে বিদ্যাসাগর স্মরণে এক বিশাল সভা আয়োজন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩৪। তিনি ওই স্মরণসভায় এক প্রবন্ধপাঠের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মসাধনার বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং পরের মাসেই (ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২) সেটি 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই আলোচনা থেকে সর্বপ্রথম যেটি বোঝা যায় সেটি হল, প্রচুর সময় দিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অত্যন্ত বিশদে এবং খুঁটিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সমগ্র আলোচনায় বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় চরিত্রের উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরকে যত তিনি জেনেছেন ততই মুগ্ধবিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়েছে তাঁর চেতনা ও মনন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সেই সময় সাধারণের মধ্যে কিছুটা ভাসা-ভাসা ধারণা প্রচলিত ছিল, মূলত তাঁর পাণ্ডিত্য ও পরোপকার নিয়েই বেশি চর্চা হত। কিন্তু তার উৎস এবং তাৎপর্য কী, এ নিয়ে চর্চা হত কম। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের গভীরতা প্রসঙ্গে অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ওই প্রবন্ধের শেষ বাক্যে বলেছেন, "...দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব...।"

রবীন্দ্রনাথের এই ঐতিহাসিক মূল্যায়ন বিদ্যাসাগর-চর্চার ধারা-বদল ঘটিয়ে দিয়েছে। এই প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বলেছেন, "বিদ্যাসাগর চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান, যে গুণে তিনি পল্লীআচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালিজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া— হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে— করুণার অশ্রুজল উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমতো হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে— তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়।"

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের কতগুলি বিরল এবং অত্যন্ত শিক্ষণীয় দিক রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন, যেগুলি আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে উপলব্ধি করা দরকার। না হলে বিদ্যাসাগর-চর্চা সম্পূর্ণ হতে পারবে না। যেমন, (১) "বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না। প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। ...চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না। ...এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না।" (২) "যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। ...তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড় কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, নিজের কোনোপ্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই।" (৩) "আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই। তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই।" (৪) "বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে। তাহাতে বাঙালি-দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না।" (৫) "পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।" (৬) "আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। ...আমরা অতি সহজেই 'আহা উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ— পুরুষোচিত। এইজন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার। তাহা কোথাও সূক্ষ্মতর্ক তুলিত না, নাসিকাকুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না, একেবারে দ্রুতপদে, ঋজুরেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসঙ্কোচে আপন কার্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত।" (৭) "তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাহাদিগকে ভালোমানুষ অমায়িক প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ, কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না।" (৮) "বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। ...আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল।" (৯) "আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল।" (১০) "আমাদের এই অপমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়— মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।... একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।" তিনি বলেছেন, "বিদ্যাসাগরের দান বাংলা ভাষার প্রাণপদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয়নি।"

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের অসাধারণত্ব রবীন্দ্রনাথকে ব্যাপক ভাবে

সাতের পাতায় দেখুন

ব্যর্থতা ঢাকতেই বিভেদের চক্রান্ত

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) পাশ হওয়ার পরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যে রাজ্যে। আগুন জ্বালিয়ে, ভাঙচুর এবং রাস্তা অবরোধ করে চলছে প্রতিবাদ। পরিস্থিতি সামলাতে জারি হয়েছে কার্ফু। বিক্ষোভ হঠাতে পুলিশের গুলিতে আসামে প্রাণহানিও ঘটেছে বেশ কয়েক জনের। দিল্লিতেও ছড়িয়েছে আগুন। পুলিশের হাতে মার খেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। অন্যান্য রাজ্যেও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর উঠছে। পশ্চিমবাংলাতেও মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, বিজেপি একের পর এক এমন বিভাজন সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে কেন— যা দেশজুড়ে পরিবেশ-পরিস্থিতিকে এভাবে অশান্ত করে তুলছে? দেশের মানুষ তো বিজেপির কাছে নাগরিকত্ব সংশোধনীর মতো আইন আনার দাবি জানায়নি! যে মানুষগুলি এ দেশে জন্মে, বড় হয়ে, পড়াশোনা করে, পরিশ্রম করে সমাজের উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে চলেছে, ভোট দিয়ে একের পর এক সরকার গঠন করেছে, আজ তাদেরই কেন নাগরিকত্বের পরীক্ষা দিতে হবে? কেন বিজেপি নেতারা আনলেন এমন একটি আইন? বিজেপি সভাপতি তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, দলের ইস্তাহারেই বিলটি আনার কথা ছিল।

ইস্তাহারে তো শুধু সিএবি (ক্যাব) আনার কথা ছিল না, ছিল আরও বহু প্রতিশ্রুতি যেগুলি দেশের মানুষের জীবনের সাথে সরাসরি জড়িত। সেগুলিকে সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র ক্যাব কার্যকর করার জন্য বিজেপি নেতারা উঠেপড়ে লাগলেন কেন?

সারা দেশ মন্দার আগুনে পুড়ছে। প্রতিটি জিনিসের দাম আগুন। মানুষ একবেলা খেলে আর একবেলা কী খাবে তা ভেবে পাচ্ছে না। বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে। গত পঁয়তাল্লিশ বছরে সর্বোচ্চ হারে পৌঁছেছে বেকারি। মানুষের কেনার ক্ষমতা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। কারখানাগুলিতে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হচ্ছে না। মালিকরা উৎপাদন কমাতে লে-অফ করছে, শিফট কমাচ্ছে। ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে লাখ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী। অথচ বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল তারা জিনিসপত্রের দাম কমাবে। বছরে ২ কোটি বেকারকে চাকরি দেবে। কালো টাকা উদ্ধার করে কালো টাকার মালিকদের গ্রেপ্তার করে জেলে পুরবে। দুর্নীতি দূর করবে। সবার জীবনে 'আচ্ছে দিন' নিয়ে আসবে। সব কা সাথ, সব কা বিকাশ অর্থাৎ সমাজের সব অংশের মানুষের জীবনে বিকাশ ঘটাবে।

এত প্রতিশ্রুতি, যার কোনও একটি কার্যকর হলেই মানুষের সংকট-জর্জরিত জীবনে কিছুটা হলেও সুরাহা আসত— সে-সব বাদ দিয়ে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বেলাতেই শুধু ইস্তাহারের উল্লেখ করলেন কেন? আসলে বাকি প্রতিশ্রুতিগুলি ছিল ভাঁওতা— মানুষকে ঠকিয়ে ভোটে জেতার কৌশল। অনেকেরই মনে আছে, কালো টাকা উদ্ধার করে সবার অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা ভরে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি এক সময় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন, এই অমিত শাহ-ই তাকে জুমলা অর্থাৎ ভাঁওতা বলে নিজেই ঘোষণা করেছিলেন। তিনি একটি জুমলার কথা বলেছিলেন, বাস্তবে তাঁদের দেওয়া সবগুলি প্রতিশ্রুতিই জুমলা। ফলে এটা স্পষ্ট, বিজেপি নেতারা জেনে-বুঝেই মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলেন।

কিন্তু ভোটে জেতার পর মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের পথ বাতলাতে পারেননি বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা। কারণ একই সঙ্গে পুঁজিপতিদের এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থপূরণ করা সম্ভব নয়। বিজেপি শাসনে শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের বিপুল সম্পদবৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের জীবনের অভাবনীয় সংকটবৃদ্ধিই তার প্রমাণ। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাইয়ে জর্জরিত মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। এই ক্ষোভ যে কোনও সময় সরকারের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের আকারে ফেটে পড়তে পারে। এই অবস্থায় বিজেপি একদিকে তার ক্ষমতার ভোগ-দখল, অন্য দিকে পুঁজিপতি শ্রেণির সেবার কাজ চালিয়ে যাবে কীসের জোরে?

সেই জোর হল রাজনীতি, শ্রেণিশোষণ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার অভাব। সেই জোর হল শোষিত মানুষকে বিভক্ত করে দুর্বল করার নীতির জোর— যে জোরে প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরাচারী, জনবিরোধী শাসকরা ক্ষমতায় টিকে থেকেছে চিরকাল। তাই ধর্মে, বর্ণে বিভক্ত করে শোষিত মানুষকে একের বিরুদ্ধে অপরকে লড়িয়ে দেওয়ার চেনা রাস্তাটাই ধরেছে বিজেপি। মূল শত্রু পুঁজিবাদকে আড়াল করে নয়, শোষিত মানুষেরই এক অংশকে অপর অংশের শত্রু খাড়া করার অপচেষ্টা শুরু করেছে বিজেপি। তার জন্যই এনআরসি, ক্যাবের মতো সর্বনাশা আইন চালুর ষড়যন্ত্র, যাতে সমস্যায় বিপর্যস্ত মানুষের দৃষ্টি মূল সমস্যাগুলি থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়।

ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করাই বিজেপির বরাবরের রাজনীতি। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যখন দেশের মানুষ ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করছিল, জেলে যাচ্ছিল, ফাঁসিতে প্রাণ দিচ্ছিল, তখন বিজেপির পূর্বসূরি হিন্দু মহাসভার নেতারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের জিগির তুলেছিল, ভারতীয়ত্বের পরিবর্তে হিন্দুত্বের পরিচয়ই আসল পরিচয় বলে ধুয়ো তুলেছিল। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিবর্তে ব্রিটিশকে সহযোগিতা করার রাস্তা নিয়েছিল। সেদিন এই সব নেতারা দেশের মানুষের কাছে দেশবিরোধী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। সেই কালি আজও বিজেপি তার গা থেকে তুলতে পারেনি। বাস্তবে স্বাধীনতার এত দিন পরে যখন নানা অপ্রাপ্তির অসন্তোষে মানুষের মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, যখন নানা কারণে বামপন্থী আন্দোলন কিছুটা দুর্বল হয়েছে তখন সেই ক্ষোভকে বিপথগামী করে আজ বিজেপি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এবং তারপরই তারা তাদের পুরনো হিন্দুত্বের কর্মসূচি কার্যকর করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দীর্ঘ সত্তর বছরে দেশভাগের মর্মান্তিক স্মৃতি যখন দেশের মানুষ প্রায় ভুলতে বসেছে তখন এই হিন্দুত্বের কর্মসূচির ভিত্তিতে আবারও তা খুঁচিয়ে তুলে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে, বিশেষত পশ্চিমবাংলায় যেখানে দুই ধর্মের মানুষের সম্প্রীতি সারা দেশে উদাহরণ তৈরি করেছে, সেই সম্প্রীতির পরিবেশকে ধ্বংস করে ভোট-রাজনীতির খেলায় নেমেছে বিজেপি।

কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে একের পর এক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী বুর্জোয়া দলগুলি দেশের অর্থনীতিকে যেভাবে খাদের কিনারায় পৌঁছে দিয়েছে, তাতে এই পথে চলে বিজেপি নেতারা মানুষকে ভোলাতে পারবেন না, খুব বেশি হলে সাময়িক ভাবে তাদের বিভ্রান্ত করতে পারবেন। যেমন নোট বাতিলের মধ্য দিয়ে যে ভাবাবেগ তারা তৈরি করেছিলেন, পুলওয়ামা করে যে উন্মাদনা তৈরি করেছিলেন, জীবনের কঠিন বাস্তব সে উন্মাদনা স্তিমিত করে দিয়েছে। জীবনের সমস্যাগুলিকে নিয়ে শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক মহিলা সাধারণ মানুষ দেশের প্রান্তে প্রান্তে আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। আজ একদিকে শাসক শ্রেণির মানুষকে ভাগ করার এই চক্রান্তকে পরাস্ত করতে, অন্য দিকে মানুষের রুটি-রুজি নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে এই আন্দোলনগুলিকেই আরও শক্তিশালী করতে হবে। হিন্দু-মুসলিম ধর্ম নির্বিশেষে সব অংশের মানুষকে সেই আন্দোলনগুলিতে আজ এক সারিতে দাঁড়াতে হবে।

এএসআই রিপোর্ট

দুয়ের পাতার পর

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে যিনি লিখেছেন তাঁর সই থাকলেও শেষের অধ্যায়টি কে লিখেছেন তা জানা যায় না, কারণ এর শেষে কোনও সই নেই! আর এইরকম একটি অধ্যায়কে পুরাতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী সঠিক তথ্য বলেও ধরা হয় না। বোঝাই যাচ্ছে যে এটি বিকৃত। সুরয ভান, আথার আলী, রামশরণ শর্মা, ডি এন ঝা, রোমিলা থাপারের মতো ইতিহাসবিদরা খননকার্যের সময় অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। সমস্ত পুরাতাত্ত্বিক ও পাঠ্য নিদর্শন খতিয়ে দেখেছিলেন। তাঁরাও এ এস আই-এর এই দাবিকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন মসজিদের নিচে হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব নেই। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে অ-ইসলামিক নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে এএসআই বলছে। কিন্তু সেটা কী তা স্পষ্ট নয়। বিশেষজ্ঞরা এমনকি নিদর্শনগুলির কালনির্ণয় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। ঐতিহাসিক ডি এন ঝা বলেছেন, বিচারবিভাগের উচিত ছিল রায়ের আগে ইতিহাসবিদ ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত নেওয়া। বিশ্বাসের ভিত্তিতে যুক্তিকে পিছনে ঠেলে দেওয়া সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। ফলে এইরকম একটি রিপোর্টকে ভিত্তি করে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় আইনের সকল বিধি বিধান এবং বিচারব্যবস্থার সকল নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে কার্যত ন্যায়বিচারের প্রহসন ঘটিয়েছে।

ভুল সংশোধন ঃ

গণদাবীর ২৯ নভেম্বর সংখ্যায় 'নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর' নিবন্ধের ক্রম ১৯-এর পরিবর্তে ১৮ এবং পরের সংখ্যায় ২০-র পরিবর্তে ১৯ ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ছয়ের পাতার পর

প্রভাবিত করেছিল। তিনি তার উৎস খুঁজেছেন গভীর তন্ময়তার সাথে। ১৮৯৮ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আরও একটি প্রবন্ধ লেখেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রবন্ধে তিনি বিদ্যাসাগরের চিন্তা-চেতনা এবং মননের উৎকর্ষ নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গোটা বিশ্বে বিদ্যাসাগরের উপমা নেই। অবারিত শ্রদ্ধা উৎসর্গ করে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের একটা জীবন অধিক ছিল। তিনি কেবল দ্বিজ ছিলেন না, তিনি দ্বিগুণ-জীবিত ছিলেন।... সেইজন্য তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার আচরণ, তাঁহার কার্যপ্রণালী আমাদের মতো ছিল না। আমাদের সম্মুখে আছে আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ব্যক্তিগত লাভক্ষতি। তাঁহার সম্মুখেও অবশ্য সেগুলো ছিল— কিন্তু তাহার উপরেও ছিল তাঁহার অন্তর্জীবনের সুখদুঃখ, মনোজীবনের লাভক্ষতি। সেই সুখদুঃখ লাভক্ষতির নিকট বাহ্য সুখদুঃখ লাভক্ষতি কিছুই নহে।"

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের অভূতপূর্ব চরিত্রের যথার্থ পরিচয় দেশের মানুষ জানুক, তার চর্চা করুক। ১৯২২ সালের ২ আগস্ট, কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে আয়োজিত 'বিদ্যাসাগর স্মরণসভা'য় সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানকার আলোচনাতেও তিনি বিদ্যাসাগরের যথার্থ চর্চার উপর গুরুত্ব দেন। সেই আলোচনা ওই মাসেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বিদ্যাসাগর' শিরোনামে ছাপা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেছেন, 'প্রতি বছর বিদ্যাসাগরের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বক্তারা তাঁর দানশীলতা নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু তিনি তৎকালীন সমাজের রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছিলেন সে বিষয়টা চাপা পড়ে থাকে। ...বিদ্যাসাগর তাঁর সমকালীন সমাজের কাঠামোতে আঘাত করেছিলেন। সেইটিই তাঁর চরিত্রের সৌন্দর্য এবং এই কারণেই তিনি আধুনিক।'

ঘটনাক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের চিন্তার সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ জীবনের নানা পর্বে প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছেন। আলোড়িত হয়েছে তাঁর দেশ-কাল ভাবনা, শিক্ষা ভাবনা, সমাজ ভাবনা। যে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত সামাজিক প্রভাবে একসময় বাল্যবিবাহ, বর্ণপ্রথা ইত্যাদি দেশাচারের সমর্থক হয়ে পড়েছিলেন, সতীদাহ এবং নারীর চিরবৈধব্যকে প্রাচীন ভারতের গর্বের বিষয় বলে মনে করতেন, (সূত্র ঃ 'মাভৈঃ' এবং 'সমাজভেদ' নিবন্ধ) সেই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এগুলি কাটিয়ে উঠেছেন। শিরোপা গ্রহণের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের আচরণে দেখা যায় বিদ্যাসাগরেরই ছায়া।

বিদ্যাসাগরকে সরকার সিআইই দিতে চাইলে তিনি তা এড়াতে কিছু দিন কলকাতার বাইরে গিয়ে কাটিয়েছিলেন। পরে বাড়ি বয়ে সেই পদক দিতে এসে রাজকর্মচারীরা যখন বখশিস চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'ওই স্বর্ণপদক বেনের দোকানে বেচে যা পাবে নিয়ে নাও।' আর, রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন নোবেল প্রাপ্তির টেলিগ্রাম এল, তিনি শান্তিনিকেতনের সচিবের হাতে সেই টেলিগ্রাম দিয়ে বলেছিলেন, 'এই নিন, নেপালবাবু, আপনার নালা তৈরির খরচ।' ১৯৩৯ সালে মেদিনীপুরে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির' উদ্বোধন করে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেছিলেন ৭৮ বছরের রবীন্দ্রনাথ। নোবেলজয়ী বিশ্বকবি বলেছিলেন, "বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই। কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া— সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া— সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব।" (চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মানবাধিকার হরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিশিষ্টরা

গুজরাট ঃ ৭১ তম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস রাজ্যে রাজ্যে পালিত হল ১০ ডিসেম্বর। এদিন আমেদাবাদের সরদারবাগে 'মুভমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি' মানবাধিকার সংক্রান্ত এক সভার আয়োজন করে। সংগঠনের আহ্বায়ক সাংবাদিক প্রকাশভাই শাহ, নির্ঝরিবেন সিনহা, সামসদ পাঠান, স্মিতা পাণ্ড্য সহ বিশিষ্টজনেরা দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরে আন্দোলনের আহ্বান জানান। সভা সঞ্চালনা করেন মীনাক্ষি যোশী। উপস্থিত ছিলেন দ্বারিকানাথ রথ।

কলকাতা ঃ ১০ ডিসেম্বর কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর আহ্বানে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ঃ বিপন্ন মানবাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতা' বিষয়ক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কাশ্মীর সহ সারা দেশে যে ভাবে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে এবং সাম্প্রতিক এনআরসি, ক্যাব সহ সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যে ভাবে হরণ করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কলকাতা ও সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জাস্টিস মলয় সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা অনিন্দিতা ঘোষাল, বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক স্বাতী চক্রবর্তী, আসামের এনআরসি-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা সুরতজামান মণ্ডল (ছবিতে ভাষণরত) প্রমুখ। গুজরাটের বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রকাশ ভাই শাহ, কাশ্মীর টাইমস পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক অনুরাধা ভাসিন, ঝাড়খণ্ডের চিত্র নির্মাতা মেঘনাথ প্রমুখ কনভেনশনের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠান। সভাপতি ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত মানবাধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানান। বিচারপতি মলয় সেনগুপ্তকে সভাপতি ও অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথকে সম্পাদক করে কনভেনশন থেকে ১৮৪ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

বিভেদকামী এনআরসি-সিএএ মানব না
এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

রায়পুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কোচবিহার

গুনা, মধ্যপ্রদেশ। বক্তব্য রাখছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল

আন্দোলনের শপথে সোচ্চার শ্রমিক সম্মেলন

শ্রমজীবী মানুষের উপর বহুমুখী আক্রমণ প্রতিরোধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৫ ডিসেম্বর এ আই ইউ টি ইউ সি-র ২২তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল হুগলির শ্রীরামপুরের রবীন্দ্রভবনে। পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। কমরেড এ এল গুপ্তাকে সভাপতি এবং কমরেড অশোক দাসকে সম্পাদক করে ৫৯ জনের রাজ্য কমিটি নির্বাচিত হয়। সম্মেলন থেকে ৮ জানুয়ারি দেশব্যাপী ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

সরকারি অবহেলায় দুর্গত চাষিরা ক্ষতিপূরণে বঞ্চিত

রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির মালিকরা তাদের নিজের নামে রেকর্ড না থাকলেও বুলবুল ঝড়ের ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির মালিকদের এই আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে না। এর প্রতিবাদে ১৩ ডিসেম্বর কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কৃষিমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়। পরিষদের সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক বলেন, পঞ্চায়েত-প্রধানদের কাছে ঘুরে ঘুরে, অর্থ খরচ করে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে আবেদন করার পরেও চাষিদের ফর্ম জমা নিচ্ছে না ব্লক কৃষি দপ্তর। ফলে কৃষক হয়রানি ও বঞ্চনার জন্য মন্ত্রী তাঁর দায় এড়াতে পারেন না। তিনি আরও জানান, কৃষকরা যাতে তাঁদের ফর্ম জমা করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করার জন্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে কৃষক সংগ্রাম পরিষদ বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে।

দিল্লিতে ছাত্রদের উপর পুলিশি হামলা ঃ বিক্ষোভ ডিএসও-র

১৫ ডিসেম্বর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশের গুলিচালনায় তীব্র ধিক্কার জানায় ডিএসও। সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক ১৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শিক্ষাসহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে নজর ঘুরিয়ে দিতে, জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী মানসিকতার উস্কানি দিতে এনআরসি ও সিএএ চালুর পরিকল্পনা করেছে।

এর বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর বর্বর আক্রমণ এমনকি গুলি চালিয়েছে পুলিশ। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এ দিন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটে বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, ডাঃ শুভঙ্কর চ্যাটার্জী, রাজ্য সভাপতি কমরেড সামসুল আলম ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। কলেজ স্ট্রিট মোড়ে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com